দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 AUG 1998 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি একটি পর্যালোচনা

মোঃ ওয়ালি উল ইসলাম

বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে ৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে দেশের কিছু কিছু এলাকায় "শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি" নামে একটি প্রকল্প সরকারি এবং বৈদেশিক উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অর্থায়নে চালু রয়েছে। প্রকল্পটি দেশব্যাপী পরিচালিত নয়। চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট থানাগুলো এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৫ থেকে ১১ বছর বয়সের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তিতে অনুপ্রাণিত ও স্থায়ীভাবে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে- প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার বিনিময়ে ছাত্রদের দরিদ্র পিতা-মাতা প্রতিমাসে তাদের প্রতি সন্তানের জন্য ১৫ কেজি করে সর্বাধিক দুই সন্তানের জন্য ৩০ কেজি খাদ্যশস্য বিনামূল্যে পায়। বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া আশির দশকের শেষ দিকে আইন প্রণয়ন করে সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এত কিছুর পরেও দেখা গেল বাংলাদেশের অনেক নাগরিক, বিশেষ করে দরিদ্র পিতা মাতা তাদের সন্তানদেরকে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণের জন্য আগ্রহী নয়। এমন কি কিছু কিছু পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে ভর্তি করলেও অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে তারা তাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে- ফলে তাদের সন্তানরা অতি অল্প দিনের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করে চলে আসছে। মূলত এই অবস্থার উন্নতিকল্পেই দরিদ্র পিতা-মাতাকে প্রলুব্ধ করে তাদের সন্তানদেরকে প্রাথমিক স্কুলে প্রেরণের জন্য আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যেই আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বেশ কয়েক বছর ধরে সীমিত আকারে চলছে।

এই প্রকল্পে সরকারের বিনিয়োগ কতটা যুক্তিসঙ্গত সে বিষয়ে নানাজনের নানা মত আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। কারণ এ প্রকল্পে ডেলিভারি সিসটেমে (মূল উপকরণের বিতরণ ব্যবস্থায়) নানা রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে ডেলিভারি সিসটেমের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে যেকোন মহৎ উদ্যোগের সফলতা লাভ করা প্রায় দুঃসাধ্য। তবে আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরুর পর থেকে প্রকল্পভুক্ত এলাকায় প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ছাত্রদের স্কুল ত্যাগের প্রবণতাও অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যে কারণে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে সফলতার হারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে বিভিন্ন জরিপের ফলাফল থেকে জানা যায়। তবু অনেকের ধারণা, এই প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রকল্প গ্রহণের পেছনে 'শিক্ষা-অর্থনীতির' যে তাত্ত্বিক বিষয়টি গভীরভাবে সম্পৃক্ত সে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি এবং পরিচালনার যৌক্তিকতা পর্যালোচনা করতে চাই।

প্রথমে 'শিক্ষা-অর্থনীতির' কথা বলে হয়ত একটা বিতর্কের সৃষ্টি করলাম। শিক্ষা-অর্থনীতিকে সাধারণ অর্থনীতি থেকে আলাদা করে দেখতে অনেক অর্থনীতিবিদই রাজি হবেন না। কারণ ষাটের দশকের গোড়ার দিকেও শিক্ষা-অর্থনীতি বিষয়টি তেমনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। তখনও Expenditure on Education was considered as consumption. ষাটের দশকের শেষ ভাগে এসে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখা গেল Expenditure on Education is a good investment। তখন থেকেই পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিশেষ করে আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ ইত্যাদি দেশে শিক্ষা-অর্থনীতিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হতে থাকে। কারণ সাধারণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগের বিপরীতে Return-এর বহুলাংশই প্রত্যক্ষ কিন্তু শিক্ষা-অর্থনীতির বিনিয়োগের বিপরীতে Return-এর বহুলাংশই অ-প্রত্যক্ষ এবং যার হিসাব-নিকাশ করাও খুবই জটিল। তাই সাধারণ অর্থনীতি থেকে শিক্ষা-অর্থনীতিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করাকে অনেকে সমীচীন মনে করেন। সেই শিক্ষা-অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, প্রকৌশল, মেডিক্যাল, স্নাতকোত্তর ইত্যাদি) মূল্য নির্ধারণ (Unit cost of Education) করা। শিক্ষা মূল্য নির্ধারণের সময় যে তিনটি Factor প্রধানত বিবেচনা করা হয়- তা হচ্ছে (১) Institutional cost (প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়) (২) Student Cost (ছাত্রের বা অভিভাবকের ব্যয়) (৩) Opportunity cost বা Income foregone (ছাত্রের বা অভিভাবকের আর্থিক ক্ষতি)। ঐ তিনটি Factor এর মধ্যে প্রথম দুটি সহজেই বোধগম্য এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না- তাছাড়া বক্ষ্যমাণ আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে ঐ দুটি Factor-এর তাৎপর্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেষেরটি অর্থাৎ ৩নং Factorটি আলোচ্য নিবন্ধের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্যই কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

Opportunity cost বা Income Foregone বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে শিক্ষার যেকোন স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণকালীন সময়টা শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে অন্য কোন কাজে ব্যয় করলে সে কাজের বিনিময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটত তা থেকে বঞ্চিত থাকতে পারার কারণে ছাত্রছাত্রীরা বা তাদের অভিভাবকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। তাছাড়া একই কারণে জাতি (Nation) ও জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সম্ভাব্য উৎপাদনযুক্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিলেও ছাত্রছাত্রী বা তাদের অভিভাবকের ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু নিতান্ত কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার স্তরভেদে নির্দিষ্ট শিক্ষা স্তরের মোট একক মূল্যের (Total Unit Cost) ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানের বেকারত্বের যুগে কোন একটি বিশেষ স্তরের শিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিলেও ঐ স্তরের শিক্ষার মোট একক মূল্যের কমপক্ষে ৩০ শতাংশ আসবে Opportunity cost-এর কারণে। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের একক মূল্য নির্ধারণে Opportunity cost-এর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে শিল্পোন্নত দেশসমূহে স্তরভেদে শিক্ষার মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষার স্তর যত উঁচু Opportunity cost তত বেশি, শিক্ষার স্তর যত নিচু Opportunity cost তত কম এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার একক মূল্যে Opportunity cost-এর অংশ শূন্য। এইখানেই শিল্পোন্নত দেশ এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদেরকে কোন কাজ করতে হয় না বা তাদের অভিভাবকদেরকে ঐ বয়সের সন্তানদেরকে পড়াশুনার পরিবর্তে কাজ করানোর কথা চিন্তাও করতে হয় না। ফলে ঐসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার একক মূল্যে Opportunity cost-এর অংশ শূন্য। কিন্তু আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে যদি আমরা নজর দেই তাহলে সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখতে পাব। এই সমস্ত দেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সমাজের পিতামাতা তাদের সন্তানদের বয়স পাঁচ বছরের অনেক কম থাকা অবস্থায়ই তাদেরকে কোন না কোন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। ফলে তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না। এটা আমরা হরহামেশাই দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। দু' একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে বলে আশা করছি। যেমন ধরুন- এই ঢাকা শহরেই আমাদের আশপাশে প্রতিদিন আমরা দেখতে পাচ্ছি শত শত হতদরিদ্র মায়েরা কোলের শিশুসহ দু' তিনটা বাচ্চা নিয়ে ইট ভাঙছে। কোলের শিশুটিকে হয়তো তার চেয়ে বড়টি দেখাশুনা করছে আর তার চেয়ে বড়টি একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে মাকে সাহায্য করছে। এতে মায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয় বাড়ছে। কাঁচাবাজারে গেলে আপনি দেখতে পাবেন অনেক কটি শিশু আপনার পিছে পিছে ঘুরছে আপনার ব্যাগটা বহন করার জন্য বিনিময়ে আপনার কাছ থেকে দু' একটা টাকা পাওয়ার আশায়। এমনিভাবে ডাস্টবিনের আশপাশে পরিত্যক্ত কিছু জিনিস পত্রের সন্ধানে অথবা গাছপালা, বনে-জঙ্গলের আশপাশে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে অসংখ্য শিশু প্রতিনিয়ত কিছু আয়ের আশায় ঘুরে বেড়ায়। একটু এগিয়ে গ্রামের দিকে হাঁটলে একই চিত্র নজরে পড়বে। দিনমজুর অথবা প্রান্তিক চাষী পরিবারের পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের সন্তানরা কেউ বাবার জন্য মাঠে খাবার নিয়ে গিয়ে, কেউ গরু-ছাগলগুলোকে মাঠে চড়িয়ে, কেউ হাঁস-মুরগির তত্ত্বাবধান করে, কেউ ডিম-দুধ বাজারে বিক্রি করে অথবা কেউ কেউ আবার তাদের পিতামাতার কোলের শিশুটিকে দেখভাল করে পিতামাতার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে সরাসরি আর্থিকভাবে লাভবান করছে।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আমাদের দেশের দরিদ্র পিতামাতা তাদের পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে কোন না কোনভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও লাভবান হচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষা-অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার একক মূল্যে Opportunity cost যেখানে শূন্য হওয়ার কথা সেখানে আমাদের দেশে ঐ স্তরে শিক্ষার একক মূল্যে Opportunity cost-এর অংশ মোটেও শূন্য নয়, বরং সেটা যথেষ্ট এবং এই কারণে আমাদের দেশের দরিদ্র পিতামাতা Opportunity cost অর্থাৎ তাদের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে পারে না বলেই তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় না। যাহোক শিক্ষা-অর্থনীতির এই তত্ত্বের বিষয়ে সচেতনভাবেই হোক অথবা বাস্তব ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সমস্যার সমাধানের জন্য এডহক ব্যবস্থা হিসেবেই হোক শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি নামে গৃহীত প্রকল্পের অধীনে চিহ্নিত দরিদ্র জনগণের সন্তানরা অধিক হারে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হতে এবং পড়াশুনা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পিতামাতা শিক্ষার বিনিময়ে তাদের প্রতি সন্তানের জন্য যে ১৫ কেজি বা দুই সন্তানের জন্য ৩০ কেজি খাদ্যশস্য পাচ্ছে- "সেটা আর কিছু নয় প্রাথমিক শিক্ষার Opportunity cost-এর Compensation বা ক্ষতিপূরণ"। নগদ অর্থে অথবা খাদ্যসামগ্রীর আকারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা না করা গেলে তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হবে না। ফলে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে সরকারের প্রতিশ্রুত নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচি কোনভাবেই সফলতা লাভ করবে না। তাছাড়া বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিঘোষিত দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার বিনিময়ে সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে এক যাত্রায় দুই ফল লাভ করা সম্ভব হবে। তবে Target Group চিহ্নিত করার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে- যাতে করে প্রকৃত দুস্থ ব্যক্তিই তালিকাভুক্ত হতে পারে এবং সরকার প্রদত্ত সুবিধা লাভ করতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও শিক্ষা-অর্থনীতির আলোকে বিচার করলে- শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ন্যায় প্রকল্প গ্রহণের এবং পরিচালনার যথার্থতা সম্পর্কে বিতর্কের তেমন কোন অবকাশ নেই। তবে প্রকল্পের Modus operandi অর্থাৎ প্রকল্প পরিচালনার পদ্ধতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়টা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখার প্রয়োজন আছে। কারণ প্রকল্পের concept সঠিক এবং যথাযথ হলেও অনেক সময় প্রকল্প পরিচালনায় ত্রুটির কারণে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে কারণে আলোচ্য প্রকল্পটির ক্ষেত্রে চারদিক থেকে সমালোচনার ঝড় উঠতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই প্রকল্পের ব্যাপারে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, কোন এক সেমিনারে এই প্রকল্পের অপচয় রোধ করার জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে প্রকল্পটি Conceptually খুবই Sound কিন্তু এর পরিচালন প্রক্রিয়ার Delivery System অর্থাৎ উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে অপচয়ের পরিমাণ খুবই বেশি। এই প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র ছাত্রদেরকে মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে খাদ্যশস্য প্রদানের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে- সেটা এতই অদক্ষ যে ভুক্তভোগী ছাত্র তার প্রাপ্য খাদ্যশস্যের অনেকটা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত উক্তির কথাই মনে পড়ে যায়- "চাটার দলে সব চেটে খেয়ে ফেলছে"। এই প্রকল্পের অপচয় রোধকল্পে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতিমাসে প্রদেয় ১৫ কেজি খাদ্যশস্যের পরিবর্তে ঐ পরিমাণ খাদ্যশস্যের মূল্য হিসেবে সমপরিমাণ অর্থ, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা হারে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা শিক্ষাখাতে অন্য একটি প্রকল্পে (মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্টাইপেন্ড প্রকল্প) বেশ কিছুদিন ধরে সারাবাংলাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের স্টাইপেন্ড প্রকল্পের ন্যায় ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত দুস্থ ছাত্রদেরকে অথবা তাদের অভিভাবকদেরকে একই পদ্ধতিতে স্টাইপেন্ড প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয় এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমেও অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। এই নিবন্ধের প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক কাঠামোতে বিতরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত করা যাবে না বিধায় অপচয় থাকবেই। তবে কোন্ প্রক্রিয়ায় এই